রাজদরবারের সভাগায়ক তানসেন: একটি রাজনৈতিক বীক্ষণ

আকলিমা ইসলাম কুহেলী*

সারসংক্ষেপ

হিন্দুস্তানি সংগীতের শ্রেষ্ঠ গুণী সংগীতজ্ঞ মিয়া তানসেনের নাম ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের সংগীতজ্ঞদের কাছে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত। যদিও তাঁর সুদীর্ঘ সংগীত জীবনের ইতিবৃত্ত 'আইনি আকবরী' অথবা 'পাদশানামা' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ দুর্গের অভ্যন্তরে পাওয়া যায় তবে তা সাধারণ সংগীত বোদ্ধার কাছে দুর্ভেদ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, তাঁর দরবারে তানসেনের অবস্থান ও তাঁর বর্ণাঢ্য সংগীত জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে।

ভূমিকা

দরবারী ও আরণ্যক সংগীতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দরবারের উপযুক্ত বা দরবারে ব্যবহৃত আভিজাত্যপূর্ণ সংগীত হচ্ছে দরবারী সংগীত, আর আরণ্যক হচ্ছে নিভৃতে নির্জনে প্রার্থনার সংগীত। স্তোত্র গাথা গান তথা উদ্ গান প্রভৃতিই এই সংগীতের রূপ। অরণ্যে একান্তে চর্চিত হতো বলেই হয়তো একে আরণ্যক নামে অভিহিত করা হয়েছে। বেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা বা তার রূপ দেখলে মনে হয় যে সেগুলো লোকালয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। দরবারে যখন হিন্দুস্তানি সংগীত জায়গা করে নেয় তখন তার শ্রোতা হয় রাজা বাদশাহ। তাঁরা এই সকল গুণী সংগীতজ্ঞদের শুধু খাতিরই করতেন না, অনেকে তাঁদের শিষ্যত্বও গ্রহণ করতেন। সে রকমই একজন সংগীতজ্ঞ সুরসম্রাট তানসেন। তানসেনের কথা সংগীতকুলের সকলে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এ কথা অনস্বীকার্য যে পূর্বের যে সংগীতের নিদর্শন আমরা পাই তাতে দেখা যায় তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাস ও তানসেনের যুগেই সংগীতের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজদরবারে সভাগায়কের পূর্বাবস্থা

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে রাজদরবারের সভাগায়ক সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রাচীনকালে সংগীতের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেন:

> রামায়ণে রামচন্দ্রের সভায় লবকুশের সংগীত চর্চা, মহাভারত যুগে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে বৃন্দাবন প্রতিধ্বনিত হওয়া- এ সকল কিছুতেই প্রমাণিত হয় যে সংগীত বিদ্যা অতি প্রাচীন। সংগীতের সকল আচার্যগণই সামবেদকে সংগীতের উৎপত্তিস্থল মনে করেছেন। মহাভারতের যুগে ষোল হাজার গোপিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকেই একটি করে রাগিনী সৃষ্টি করেছেন। সেই কারণেই পুরাণে ষোল হাজার রাগিণীর নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ৩৩০ খ্রিস্টপূর্ব আলেকজান্ডারের দরবারে সংগীত চর্চার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোম ও কার্থেজের মধ্যে সংঘটিত তিনটি যুদ্ধকে একত্রে পিউনিক যুদ্ধ বলে। সেই পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমানদের ভেরী বাজানো বা ৪০ খ্রিস্টপূর্ব ক্লিওপেট্রার দরবারেও সংগীত চর্চার নিদর্শন মেলে। সোমনাথ মন্দিরে দুইশত বেতনভোগী গায়ক ছিলেন যারা সেখানে সংগীত পরিবেশন করতেন। ১৩০০ খ্রি. আলাউদ্দিনের সময় হিন্দুস্তানি সংগীত ব্যবহৃত ও চর্চিত হয় (রায়চৌধুরী, ২০০৬: ১৪)।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে যা থেকে রাজদরবারে সভাগায়ক হওয়ার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভারতীয় সংগীতের জয়যাত্রা শুরুর কাল নির্ণয় কঠিন হলেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রারম্ভ সম্ভবত বৈদিক যুগেই হয়েছিল। শুরুতে সামগান বা আরণ্যক প্রচলনে থাকলেও পরবর্তীকালে তার রূপ পরিবর্তিত হয়ে অন্য ধারার সংগীতের বিকাশ হয়। এর মধ্যে খেয়াল গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাদশা ও নবাবদের মনোরঞ্জনের এক অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এই খেয়াল। ১৮শ শতকের শেষের দিকে খেয়াল গান উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তীকালে টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতিও উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারা রূপে পরিগণিত হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে মুসলিম শাসকতন্ত্র অর্থাৎ মোঘল ও পাঠানদের রাজত্বকালে ভারতীয় সংগীতের চর্চা, প্রচার ও প্রসারের আধিক্য ছিল লক্ষণীয়। সমালোচকের ভাষায়:

> সেই সময় রাজ দরবারের আবদ্ধ কুঠরিতে সাধারণ গীতিগুলোই অলংকার বহুল শাস্ত্রীয় সংগীতের রূপ নেয় আর প্রাচীন প্রবন্ধগীতির রূপ পরিবর্তিত হয়ে ছয় ও চার তুকের ধ্রুপদে পরিণত হয়। অন্যদিকে সাধারণগীতি ও কাওয়ালীর মিশ্রণে তৈরি হয় খেয়াল। পরবর্তীকালে আমীর খসরু ও জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কীর দরবারে তা স্থান পায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় শাহজাহানের দরবারে ধ্রুপদের পাশাপাশি খেয়াল জায়গা করে নেয় (মুখোপাধ্যায়; ২০০৩: ৭৪)।

পারস্যের অভিজাত বংশীয় কবি, গায়ক কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমীর খসরু ছিলেন অন্যতম। পারস্য সংগীতের সাথে হিন্দুস্তানি সংগীতের মিশ্রণে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। ১৪০০ শতাব্দীর শুরুর দিকে দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিন পারস্য দেশ থেকে আমীর খসরুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ সভায় নিয়ে আসেন। আমীর খসরু একদিকে যেমন ছিলেন কবি-দার্শনিক অন্যদিকে ছিলেন রাজনিতিক ও বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। তিনি শুধু কলাবিদই নন, মন্ত্রী ও ধর্মগুরু হিসেবেও আলাউদ্দিনের দরবারে বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। তার রচিত অসংখ্য গান রয়েছে যাতে ফারসি সংস্কৃত ও গুজরাটি ভাষার মিশ্রিতরূপ পরিলক্ষিত হয়। যে সময় আমীর খসরু আলাউদ্দিনের দরবারে ছিলেন সেই সময়েই দাক্ষিণাত্য থেকে নায়ক গোপাল নামক এক দিগ্বিজয়ী গায়ক ও পণ্ডিত বাদশা আলাউদ্দিনের নিমন্ত্রণে তাঁর দরবারে স্থায়ীভাবে স্থান পান। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে আরেকজন সিদ্ধপুরুষ তথা সংগীত কলাবিদের নাম শোনা যায়, তিনি হলেন বৈজু বাওরা। তাঁর প্রতিভার যোগ্য মূল্যায়নপূর্বক সম্রাট আলাউদ্দিন তাঁকে নিজসভায় আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় গোপাল নায়ক ও আমির খসরু আলাউদ্দিনের দরবারে উপস্থিত থাকলেও এবং তাঁরা বৈজু বাওরা অপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও বৈজুর কণ্ঠস্বর ছিল অধিক শ্রুতিমধুর। নায়ক গোপাল গাইতেন প্রাচীন ছন্দপ্রবন্ধ যুক্ত হিন্দুস্তানি গান আর বৈজু বাওরা গাইতেন চারতুক বিশিষ্ট ধ্রুপদ গান। বৈজু বাওরা রাজদরবারে অধিককাল না থাকলেও তাঁর প্রবর্তিত ধ্রুপদ পদ্ধতি অনুসরণ করেই গোপাল নায়ক অনেক ধ্রুপদ রচনা করেন। কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার গ্রন্থে লিখেছেন:

> দরবারে যখন হিন্দুস্তানি সংগীত জাঁকিয়ে বসলো তখন শ্রোতার স্থান নিলেন রাজ বাদশা, তার আমলরা, বেশ কিছু সমঝদার এবং অন্যান্য গায়ক এবং বাদকরা। জমিদারতন্ত্র উঠে যাওয়ার পূর্বে বেশিরভাগ রাজা ও নবাবরা শুধু ওস্তাদদের প্রচুর খাতির করতেন তাই নয়, অনেকেই ওস্তাদদের গাণ্ডাবন্ধ শার্গীদও ছিলেন। দরবারী গানে শ্রোতাদের চিত্তজয় করার জন্য এই প্রথম দক্ষতা, কুশলতা, এক কথায় ভার্চুয়োসিটির মূল্য বাড়লো। সেই সাথে আবির্ভাব হল অহং চেতনার। মুখে তারা বলতেন আল্লাহর ফজল, ঈশ্বরের কৃপা, বুজুর্গদের দোয়া, হুজুরের বান্দানওয়াজি - কিন্তু মনের মধ্যে থাকতো আত্ম প্রশংসা এবং গলা ঘুরানোর আনন্দ। (মুখোপাধ্যায়, ২০০৩: ৭৭)

ভারতীয় সংগীত তথা সংস্কৃতির প্রতি মধ্যযুগের নবাব বাদশাহের আগ্রহ যেমন অধিক ছিল তেমনি ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিও তাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন। হিন্দু রাজারা যেভাবে গুরু ও পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করতেন ঠিক একইভাবে মধ্যযুগের নবাবরাও গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। সম্রাট আকবর (১৫৫৬ - ১৬০৬) থেকে রামপুরের নবাব হামিদা আলী খাঁ (১৮৮৭ - ১৯২৮) পর্যন্ত

অসংখ্য নবাব বাদশাহেরা সংগীতের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর সেই কারণেই মধ্যযুগের সংগীত ও ললিতকলা অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভে সক্ষম হয়। মুঘল আমলে পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে রাজদরবারে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতের ধারা পাল্টায়। ধর্মীয় সংগীত থেকে সরে এসে ধর্মনিরপেক্ষ সংগীতের চর্চা শুরু হয় যে সংগীতে প্রেম বিরহের পাশাপাশি রাজার স্তুতি ও প্রশংসা জায়গা করে নেয়। মীনাক্ষী বিশ্বাস তার গ্রন্থে লিখেছেন

> বাদশাহী যুগে খেয়াল ধীরে ধীরে শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতে উৎপত্তি লাভ করে এবং অপরদিকে ধ্রুপদের প্রচার ও প্রসার স্তিমিত হতে থাকে। এর প্রধান কারণ বাদশাহের দরবারে মনোরঞ্জনের জন্য খেয়াল এক আদরণীয় স্থান লাভ করেছিল। মুঘল বাদশারা এর খুবই কদর করতেন। ভারতীয় সংগীতের যে মহান ঐতিহ্য তার সাধনার মধ্যে ব্যপ্ত ছিল (দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী) এই বাদশাহী আমল থেকেই তার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে যে আত্মিক তন্ময়তা, প্রসন্নতা আসে, শক্তির প্রতি আত্মবিনিয়োগের ভাব আসে সেটা এই বাদশাহী আমল থেকেই ক্রমে সরে যেতে থাকে শিল্পীর মন থেকে। বাদশা বা শ্রোতার মনোরঞ্জনই সেখানে শিল্পীর উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে। (বিশ্বাস, ২০১৩: ২৮-২৯)

রাজদরবারে তানসেনের অবস্থান

ভারতবর্ষের সংগীতজ্ঞরা প্রায় সকলেই প্রকৃত সাধক ছিলেন। এদের অধিকাংশ শুধু সংগীত সাধনাতেই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিভিন্ন রাজসভাই তাঁদের সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তবে অনেকেই মনে করতেন রাজসভার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে বৃহত্তর জনসাধারণ সেই সংগীতের শ্রোতা যেমন হতে পারে না তেমনি তারা প্রকৃত সংগীতশিক্ষা থেকেও হয় বঞ্চিত। যার ফলে অনেকে সেই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে চাইতেন। যেমনটা আমরা দেখতে পাই বৈজু বাওরার ক্ষেত্রে। মোঘল যুগে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতজ্ঞরা উচ্চাঙ্গসংগীতের ওপর বিভিন্ন নিরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পেলেও কিংবা সেই সময়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কাঠামোতে নানা পরিবর্তন এসে নতুন নতুন সুর সৃষ্টি হলেও এই দরবারী পৃষ্ঠপোষকতার গৌণ ফলাফল যে ছিল না তা নয়। গুণী শিল্পীরা রাজা পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সমাজের অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। একজন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতা। কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। রাজদরবার এমন এক স্থান ছিল যেখানে শিল্পীরা নিশ্চিন্তে একাগ্রচিত্তে সংগীত সাধনার সুযোগ পেতেন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা রাজার জয়গানের মাধ্যমে তাঁদের নিশ্চিত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে আত্মতৃপ্ত হতেন।

মোঘল সম্রাট আকবরের দরবার কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত এই দুই প্রকারের সংগীত দ্বারা বিভক্ত ছিল। দরবারে মোট ৩৬ জন শিল্পীর মধ্যে ১৪ জন যন্ত্রশিল্পী ও ২২ জন ছিলেন কণ্ঠশিল্পী। কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে সেরা ছিলেন তানসেন। প্রভাত কুমার গোস্বামী লিখেছেন:

> 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় যে আকবরের সভায় বহু সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং আবুল ফজল নিজেই বলেছেন তিনি মাত্র ৩৬ জন সংগীতজ্ঞের নাম করেছেন। ওই সব সংগীতজ্ঞের মধ্যে হিন্দু, ইরানি, তুরানী, কাশ্মীরি প্রভৃতি জাতির সংগীতজ্ঞ তো ছিলেনই, পুরুষ এবং নারীর উভয় শ্রেণীর সংগীতজ্ঞই তাঁর সভা আলোকিত করেছিলেন। সংগীত সম্রাট তানসেন ছিলেন এঁদের মধ্যমণি। (গোস্বামী, ২০০৫: ৭৭-৭৮)

সম্রাট আকবর তানসেনের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর দরবারের সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। সম্রাট আকবর মনে করতেন তানসেনের মতো একজন সাধক হাজার বছরে একবার জন্মায়। তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাস জীবিত থাকাকালীন নিজের প্রশংসা শুনতে অস্বস্তিবোধ করতেন বলে আকবর স্বামী হরিদাসের গান শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তানসেনের পরামর্শে তাঁর কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে চুপিসারে গান শোনেন। যার সত্যতার প্রকাশ মেলে মোঘল যুগের এক চিত্রাংকন থেকে যেখানে দেখা যায় স্বামী হরিদাস সাধনা করছেন, তাঁর কুটিরের বাইরে তানসেন জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন আর তানসেনের পশ্চাতে রয়েছেন সম্রাট আকবর। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী লিখেছেন:

> তানসেনের কথা বলতে গেলেও যাঁর রাজছত্র সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ ছায়াতল ছিল মনীষার একমাত্র বিকাশভূমি, কোহিনূরতুল্য অমূল্য অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাশালী পণ্ডিতদিগকে দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে এনে রাজসভা সুশোভিত করাই ছিল যাঁর একমাত্র ব্যসন, সেই মহামনীষী গুণগ্রাহী দাতা সম্রাট আকবরের স্মৃতি প্রসঙ্গতই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বহু অর্থব্যয় তাই রাজা রাম বাঘেলার দরবার থেকে তানসেনকে দিল্লিতে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি নিরস্ত থাকেন নাই - ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত দেশের সর্বজাতীয় গায়কগণকেই অনুসন্ধান করে এনে নিজের রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। (রায়চৌধুরী, ১৯৩৯: ২,৩)

অধিক সমর্থিত মতানুসারে গোয়ালিয়র এর নিকটবর্তী বেহট নামক স্থানে গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে তানসেনের জন্ম হয়। তাঁর জন্ম তারিখ ও সন নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি ১৫৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৮৯ সালে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করেন। কিন্তু উল্লিখিত তারিখের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি। বাল্যকালের তানসেনের নাম ছিল রামতনু। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দরাম পাঁড়ে অন্যমতে মকরন্দ পাঁড়ে। মকরন্দ বারাণসীতে জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি একজন সুগায়ক হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আর্থিক

স্বচ্ছলতা থাকলেও বিষণ্নতা তার পরিবারের একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায় কারণ, তার পত্নীর মৃতবৎসার দোষ থাকায় তানসেনের পূর্বে বেশ কয়েকটি সন্তানের জন্ম হলেও তার একটিও রক্ষা পায়নি। গোয়ালিয়রে হজরত গওস্ নামক সিদ্ধ পির ছিলেন যিনি মৃতবৎসা রোগের চিকিৎসা করে তা দূর করতে পারতেন– এই সংবাদ পেয়ে মুকুন্দরাম গোয়ালিয়রে গিয়ে হজরত গওস্ এর নিকট হতে কবচ এনে তা পত্নীর কলে পরিয়ে দেন। যে সন্তান জন্ম হবে সে অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে পরিণত হবে বলে হজরত গওসের ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়ে জন্ম হয় রামতনুর। মুকুন্দরামের একমাত্র পুত্র হাওয়ায় রামতনু অত্যন্ত আদুরে ছিলেন। যে-কোনো স্বরকে অবিকল অনুকরণ করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বালক রামতনুর। এর মধ্যে বনের পাখির ডাক থেকে জঙ্গলের ভয়ংকর প্রাণীর স্বর নকল করা সবই সামিল ছিল। যার ফলে অনেক সময় তাঁর নকল স্বরকে আসল মনে করে জনসমাজে ভ্রমের সৃষ্টি হতো। যে সময় রামতনুর সঙ্গে তাঁর গুরু দিব্য গায়ক স্বামী হরিদাসের সাক্ষাৎ হয় তা ছিল এক দৈব সংযোগ। একবার স্বামী হরিদাস তাঁর শিষ্যমণ্ডলীদের নিয়ে বারাণসীতে তীর্থদর্শনে এলে পথের আমতলা গাছের আড়াল থেকে তাঁদের বাঘের ডাক নকল করে ভয় দেখান। কিন্তু বুদ্ধিমান স্বামী হরিদাস কেউ ভয় দেখাচ্ছে বুঝতে পেরে শিষ্যদের সাহায্যে বালক তানসেনকে সামনে নিয়ে আসেন। স্বামী হরিদাস তানসেনের মধ্যে অপার সম্ভাবনা দেখতে পান এবং মকরন্দ পাঁড়ের কাছে গিয়ে রামধনুকে (তানসেন) তাঁর শিষ্য করে সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। আর সেই সময়ই দশ বছর বয়সে গুরুর সাথে বৃন্দাবন যাত্রার করে শুরু হয় তানসেনের সংগীত শিক্ষা।

স্বামী হরিদাসের সংগীতে যে দিব্য গরিমা ছিল তা সাধারণ জনসমাজের শোনার সৌভাগ্য হয়নি বললেই চলে। তানসেনের প্রতি স্বামী হরিদাসের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কৃপা ছিল বলেই সেই দিব্য সংগীত শ্রবণের সৌভাগ্য একমাত্র তানসেনেরই হয়েছিল। দীর্ঘ ১০ বছর তাঁর সান্নিধ্যে সংগীত শিক্ষা লাভের পর তানসেনের পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার অন্তিম ইচ্ছায় গুরু স্বামী হরিদাসের অনুমতিক্রমে তানসেন হজরত মহম্মদ গওসের সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়র যাত্রা করেন এবং তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেই সময় গোয়ালিয়রের প্রয়াত মহারাজ মানসিংহের বিধবা পত্নী রানী মৃগনয়নী একবার তাঁর দরবারে তানসেনের গান শুনে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং তানসেনকে তাঁর সংগীত বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। অমল দাশ শর্মা লিখেছেন:

> সে বিদ্যালয়ের সুকণ্ঠী হুসেনী বাহ্নীর সঙ্গে মহারানীর তত্ত্বাবধানে তানসেনের বিবাহ হয়। হুসেনীর প্রকৃত নাম ছিল প্রেমকুমারী। বিবাহের সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরে তানসেনের নামকরণ হয় মহম্মদ আতা আলী খাঁ। কার্যোপলক্ষে তানসেন একবার রেওয়াতে গেলে সেখানকার রাজা রামচন্দ্র বঘেলা তাঁর

> সংগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সভাগায়কের পদে নিযুক্ত করেন। সংযোগবশত বাদশা আকবর একবার রেওয়াতে আসেন এবং তানসেনের সংগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যান। দিল্লিতে এক সংগীত সভায় বাদশা তাঁকে 'তানসেন' উপাধিতে সম্মানিত এবং নবরত্ন সভার সদস্য রূপে অভিষিক্ত করেন। (দাশশর্মা, ১৯৯৫: ৮৭)

হজরত মহাম্মদ গওস্ ও রানী মৃগনয়নীর নিকট হতে তানসেন যৌতুক স্বরূপ পেয়েছিলেন বিস্তর অর্থ যা নিয়ে তিনি স্বামী হরিদাসের চরণে পুনরায় ফিরে আসেন। স্বামী হরিদাসের উদার মানসিকতায় জাতিভেদের কোনো স্থান ছিল না। তিনি রামতনু (তানসেন) ও আতা আলি খাঁর মধ্যে কোনো পার্থক্য না দেখতে পেয়ে পূর্বের মতোই রামতনুকে সস্নেহে গ্রহণ করেন এবং সংগীতশিক্ষা অব্যাহত রাখেন। স্বামী হরিদাস ছিলেন তানসেনের একমাত্র উপাস্য, ধ্যান ও জ্ঞান। সংগীতের যোগ সাধনার শিক্ষা তিনি সর্বাঙ্গীণরূপে তাঁর গুরুর নিকট পেয়েছিলেন। হজরত মহম্মদ গওস্ যখন অসুস্থ হন তখন গুরুর আদেশে তানসেন গোয়ালিয়র এসে মহম্মদ গওসের সেবা করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হন। হজরত গওসের মৃত্যুর পরে তানসেন কিছুদিন গোয়ালিয়রে বসবাস করলেও গুরুর নিকট যোগসাধনা ও সংগীত শিক্ষা অব্যাহত রাখেন। স্বামী হরিদাস তানসেনকে দুইশত ধ্রুপদ শেখানোর পাশাপাশি যৌগিক সপ্তচক্রে যোগ বলে সাতসুর প্রকাশের কৌশলগত দিক শিখিয়েছিলেন। যার দরুণ গুরুশক্তির প্রভাবে কালক্রমে তানসেনও নাদসিদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সম্রাট আকবর ছিলেন মধ্যযুগের একজন যুগ প্রবর্তক। রাজা বিক্রমাদিত্যের পর ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, সংগীত সকল বিষয়ের সম্রাট আকবর একজন প্রেরণার উৎস। রাজা বিক্রমাদিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সম্রাট আকবর তাঁর দরবারে নবরত্ন সভা স্থাপন করেন। তানসেন ছিলেন সেই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন। দরবারের অতুলনীয় গায়করূপে তিনি সম্রাটের অশেষ সম্মানাস্পদ দরবার ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সংগীত পরিবেশন ছাড়াও বাদশার অভিপ্রায় মতো যে-কোনো সময় তাঁকে সংগীত পরিবেশন করতে হতো। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী লিখেছেন:

> একদিন, সিংহাসনোপবিষ্ট বাদশার এমন জীবন্ত বর্ণনা তানসেন সংগীতের ঝংকারে মূর্তমান করে তুললেন যে বাদশা সেদিন আপনার কণ্ঠস্থিত মনিহার খুলে তানসেনের কণ্ঠে পরিয়ে না দিয়ে পারলেন না। আর সেদিন থেকেই 'তানসেন' পদবী হয়েছিল। বাদশার দত্ত নামের অর্থ এই যে - যিনি সংগীতের 'তানের' দ্বারা 'সেন' করতে পারেন অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেন তিনিই তানসেন। (রায়চৌধুরী, ১৯৩৯: ২৫-২৬)

উপসংহার

তানসেন স্বীয় প্রতিভাগুণে একজন ধ্রুপদী বিশারদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধ্রুপদ গাওয়ার রীতিকে, তিনি পরিমার্জন করে একে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জনপ্রিয়তার পশ্চাতে তার অবদান ও প্রচেষ্টার ফলে তিনি ধ্রুপদ সংগীতের একছত্র অধিপতির আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর পূর্বে যে সকল সংগীতজ্ঞ ধ্রুপদ রচনা করেছেন তাঁরা শব্দ ও ছন্দের ওপর অধিক গুরুত্ব দিলেও তানসেন তাঁর রচিত ধ্রুপদে সুর ও মাধুর্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়েছেন। ধ্রুপদ ও আলাপ গায়ন পদ্ধতিতে অলঙ্কার, মীড়, গমক ও মূর্ছনার প্রয়োগ পরবর্তীকালের খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরীর পূর্বাভাস বলে বিবেচিত। তানসেন একজন কবি, সংগীতজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন নতুন রাগের স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট অভিনব রাগ-রাগিনীর মধ্যে দরবারী কানাড়া, দরবারী কল্যাণ, দরবারী আসাবরী, দরবারী টোড়ি, শাহানা, মিয়া কি সারং, মিয়া কি মল্লার, মিয়া কি টোড়ি বিখ্যাত। যে সকল রাগের শুরু মিয়া থেকে, সেই রাগগুলোকে তানসেন রচিত রাগ বলে মনে করা হয়। তানসেন রবাব যন্ত্রেরও উদ্ভাবক। তানসেনের সংগীত সাধনার প্রথম প্রকাশ হয় গোয়ালিয়রে আর সেই সাধনার পূর্ণ বিকাশ হয় মোঘল সম্রাট আকবরের দরবারে। তানসেন দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয় উপভাষা ব্রজ ও খরিতে কবিতা রচনা করেছেন। সংগীতসার, রাগমালা এবং শ্রী গণেশস্তোত্র তাঁর কাব্যিক সৃষ্টি। মোঘল দরবারে যেদিন তানসেন প্রথম সংগীত পরিবেশন করেছিলেন সেই প্রারম্ভক্ষণটি সম্রাটের নির্দেশে অংকিত চিত্রে বিধৃত রাখা হয়েছিল। তানসেনের পরিবেশিত রাগ কট বা কানাড়া সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় থাকায় তিনি সেই রাগের নতুন নামকরণ করেন দরবারী। দরবারে তানসেনের সংগীত পরিবেশন সম্পর্কে অনেক কল্পিত তথ্য বা অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। তাঁর মধ্যে একটি হচ্ছে তিনি যখন দীপক রাগ গাইতেন তখন নাকি আলো জ্বলে উঠত। একবার নাকি সভায় আগুন ধরে গিয়েছিল। দীপক রাগ হচ্ছে তানসেন প্রবর্তিত সেনী ঘরানার নিজস্ব সম্পত্তি। সংগীত প্রশিক্ষণে এই রাগ বাধ্যতামূলক শেখানোর প্রচলন আজও বিদ্যমান। অমল দাস শর্মা লিখেছেন:

> কথিত আছে তানসেন নাকি তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর, শবের চারিপাশে বসে তোমরা গান গাইবে। যার গানে আমার শরীর নড়ে উঠবে সে-ই হবে আমার সংগীতের প্রকৃত ধারক। তানসেনের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রেরা যথারীতি গান আরম্ভ করলেন। সকলের শেষে বিলাস খাঁ যখন টোড়ি রাগে রচিত "কৌন ভ্রম ভুলায়ো মন অজ্ঞানী" এই ধ্রুপদখানি গাইতে থাকেন, তখন শবের হাত নাকি সোজা হয়ে ওঠে। এই অভূতপূর্ব ঘটনা অনেক লোকের সঙ্গে একজন বিদেশি ভদ্রলোকও নাকি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ওই রাগটি সেই থেকে তোড়ী নামে খ্যাত হয়। (দাশশর্মা, ১৯৯৫: ৮৯)

তানসেনের উত্তরাধিকারীরা মুসলিম নাম ধারণ করেই সংগীতের ভুবনে তাঁদের সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। তানসেনের মৃত্যুর সন নিয়ে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে ১৫৮৯। তাই এই সনকেই তাঁর মৃত্যুর সন বলে ধারণা করা হয়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু হযরত গাউসের মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়। এই উপমহাদেশের একজন সুমহান ও শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ তানসেনের সংগীত সূর্যরশ্মির মত সবখানে বিকীর্ণ হয়েছিল। উত্তর ভারতীয় সংগীতে যে সকল সংগীতজ্ঞ আজও বিদ্যমান, তাঁদের সকল পূর্বপুরুষের মধ্যেই তানসেনের প্রভাব বা শিক্ষাই পরিলক্ষিত হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের সকল গুণীজন তানসেনের সৃষ্ট পথ অনুসরণ করেছেন এবং তানসেন সৃষ্ট সংগীতই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের হিন্দুস্তানি সংগীতে বিকশিত হয়েছে। সুর সম্রাট তানসেন ছিলেন সংগীত আকাশের সর্বকালের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাঁর উদ্ভাবিত সংগীত ধারার পথ ধরেই এই উপমহাদেশের সংগীতের অগ্রযাত্রার পথ আরো সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. দাশশর্মা, অমল (১৯৯৫)। *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*। দরবারী প্রকাশন, কলকাতা

২. মুখোপাধ্যায়, কুমার প্রসাদ (২০০৩)। *খেয়াল ও হিন্দুস্থানী সংগীতের অবক্ষয়*। দে'জ্ পাবলিশিং, কলকাতা

৩. রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্র কিশোর (১৯৩৯)। *হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান*। থীমা, কলকাতা

৪. গোস্বামী, প্রভাত কুমার (২০০৫ পঞ্চম সংস্করণ)। *ভারতীয় সংগীতের কথা*। আদিনাথ ব্রাদার্স, কলকাতা

৫. বিশ্বাস, মীনাক্ষী (২০১৩)। *পরম্পরা*। সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা